একক ১ ❑ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ঐতিহাসিক উৎস ঃ লিখিত ও অলিখিত

১.৩ প্রত্নতত্ত্ব

১.৩.১ লেখমালা

১.৩.২ মুদ্রা

১.৩.৩ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ

১.৪ সাহিত্যগত তথ্যসূত্র

১.৪.১ পুরাণ

১.৪.২ মহাকাব্য

১.৪.৩ আইন ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১.৪.৪ জীবনী গ্রন্থ

১.৪.৫ বিদেশী সাহিত্য

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- ইতিহাসের তথ্যের উৎস
- ইতিহাস রচনার লিখিত এবং অলিখিত উপাদান
- ঐতিহাসিক তথ্যের উৎসগুলির শ্রেণীবিন্যাস এবং তথ্য ব্যবহার পদ্ধতি

১.১ প্রস্তাবনা

ভারত-ইতিহাস অধ্যয়নের প্রথম পর্যায়ের এই এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে—ইতিহাস রচনায় কোন্ কোন্ উপাদান আহরণ করা হয়ে থাকে, সেগুলির সহজলভ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতা; সেসব উৎসের একটি শ্রেণীবিন্যাসও করা হবে এই এককে, যার ফলে বোঝা যাবে—একাধিক উৎস ও তথ্যের ব্যবহার কীভাবে হয়। অধ্যাপক

মেইটল্যান্ডের বিখ্যাত সংজ্ঞা অনুসারে মানব জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি যা কিছু ঘটেছে তা সবই ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের শুরু থেকে তো নয়ই, এমনকী, তার পরের বহু সহস্রাধিক বছরের কোন লিখিত ইতিহাস আমাদের কাছে অনুপস্থিত, যার ফলে মানব ইতিহাসের বহু দিগন্ত পরিবর্তনকারী ঘটনার সাল-তারিখ-স্থান-কারণ ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত তথ্যের অভাবের ফলেই প্রাচীন মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। এই ব্যাপারে আমাদের সমস্ত আলোচনাই অনেক ক্ষেত্রে অনুমান-নির্ভর হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস কাহিনী-গল্পকথার অংশমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে তফাত করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

সুতরাং যে সকল তথ্য থেকে সত্য আহরণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব তা-ই ইতিহাসের তথ্য এবং এই বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সমাবেশকে মোটামুটিভাবে ইতিহাসের উৎস বলে বর্ণনা করা যায়। যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা তথ্যকে বিশ্লেষণ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তার দ্বারা মানবিক জ্ঞানের জগতে নতুন আলোকপাত করা সম্ভব, তাদের ইতিহাসের উৎস বলা হয়। যত প্রাচীন দিকে যাই ততই তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায় এবং প্রাচীন কাল থেকে যত আধুনিক যুগের দিকে আসি ততই তথ্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই বক্তব্য পৃথিবীর সব দেশ সম্পর্কেই সত্য বলে মনে করা যায়; কিন্তু তার সময়সীমা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে বিভিন্ন রকম হতে পারে। উৎসের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, মতবাদ, দেশ-কাল ভেদের বিভিন্নতার জন্যে পৃথক হতে পারে। এর ফলে ইতিহাস বিষয়টির উপর আকর্ষণ অনেক অংশে বেড়ে যায়।

উপযুক্ত উৎসের অভাব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত আরবী পণ্ডিত আল-বিরুনী প্রকাশ্যে হিন্দুদের অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা যেমন এলফিনস্টোন, ফ্লীট, স্মিথ নানা তিক্ত মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (ক) ভারতীয়দের অদৃষ্টবাদ এবং (খ) হেরোডোটাস, থুকিডাইডিসের মতো ঐতিহাসিকদের অনুপস্থিতিকেই প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস বিমুখতার জন্যে দায়ী করেছেন। এই অপবাদগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে প্রাচীন ভারতের মানুষ ইতিহাস রচনার জন্যে কোন তথ্যই রেখে যাননি—এ ধারণা যথার্থই অমূলক। যে সমস্ত বিষয় তাঁদের কাছে অর্থবহ ও রক্ষণযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলি তাঁরা অবশ্যই সংরক্ষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয়দের অতীত চর্চার নানা সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে "ইতিহাস" শব্দটিই তাঁরা তৈরি করেছিলেন। "ইতি-হ-আস" (অর্থাৎ অতীতে এমনটিই ঘটেছিল)—ইতিহাস শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছিলেন। গ্রীক "ইস্তোরিয়া" বা জার্মান "গেশিস্টে"র থেকে "ইতিহাস"-এর ধারণা ভিন্ন ও বোধ হয় ব্যাপকতরও বটে। এক্ষেত্রে তথ্যের অভাবকে সমালোচনা না করে, প্রাপ্ত তথ্যগুলি, তা যতই অপ্রতুল হোক না কেন—তাদের গুণগত মানের সমালোচনা করা দরকার। বস্তুতপক্ষে অপ্রতুল এবং আপাত-অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ঐতিহাসিকেরা বহু নতুন দিক নির্ণয় করতে পেরেছেন।

ঐতিহাসিক উৎস সব সময় লিখিত না হতেও পারে। রাজা এবং শাসকদের প্রশাসন পরিচালনা করার জন্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিভিন্ন উপাদানগুলি—যেমন লেখ ও মুদ্রা, সর্বসাধারণের ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি, ঘর-বাড়ি, মূর্তি ইত্যাদি যা বর্তমানে লুপ্ত হয়ে মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছে, তাদের উদ্ধার এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন

তথ্যের অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যা সম্ভব। এই বিদ্যা আধুনিককালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার মর্যাদায় অভিষিক্ত। এই বিষয়টি বর্তমানকালে “প্রত্নতত্ত্ব” নামে চিহ্নিত।

১.২ ঐতিহাসিক উৎস ঃ লিখিত ও অলিখিত

ঐতিহাসিক উৎসকে আমরা দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। (ক) অলিখিত উৎস, এবং (খ) লিখিত উৎস। সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসকে অলিখিত উৎসের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও ঐতিহ্য, চিত্রকলা এবং অধুনা আবিষ্কৃত কার্বন-১৪ (C^{14}) পদ্ধতিকে অলিখিত উৎসের মধ্যে ধরা হয়। এ ছাড়াও, অতি প্রাচীন কাল থেকে নানারকম কিংবদন্তী, লোককথা, গল্প, সাধারণ লোকদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়—সেগুলিকেও অবহেলা না করে আজকাল “মৌখিক ইতিহাস” বলা হয়। অতীতে জনগণের বিনোদনের জন্য হয় এইসব গল্পকে অতিরঞ্জিত করে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হত অথবা এর গল্পের দিকটি বজায় রেখে অন্যান্য বস্তুগত সত্যতাকে এড়িয়ে যাওয়া হত। কিন্তু এখানে কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করার কোন দায় গল্পকারের থাকত না।

অনুরূপভাবে লিখিত উৎসেরও নানারকম শ্রেণীবিভাজন সম্ভব। সমস্ত ঐতিহাসিক উৎসকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

১.৩ প্রত্নতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অনুসন্ধান ও খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত এবং মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত বস্তু, যার সঙ্গে অতীত ইতিহাসের যোগাযোগ আছে—এইরকম সমস্ত বিষয়বস্তু হল প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ হল প্রত্নবস্তু থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে অতীতের ধারণা গড়ে তোলা। ঐতিহাসিক এইসব মতামতের সাহায্য গ্রহণ করে ইতিহাসের সূত্র গড়ে তোলেন। প্রাচীন কালের মানুষ এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি জানবার অন্যতম চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে প্রত্নতত্ত্বকে ব্যবহার করা হয়।

প্রত্নবস্তুর বিভাজন অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে আমরা লেখমালাকে বিবেচনা করতে পারি। স্থায়ী কোন বস্তু যেমন পাথর, ধাতবখণ্ড, পোড়ামাটি, কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদির উপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় লিখন-পদ্ধতিকে লেখমালা বলা যেতে পারে।

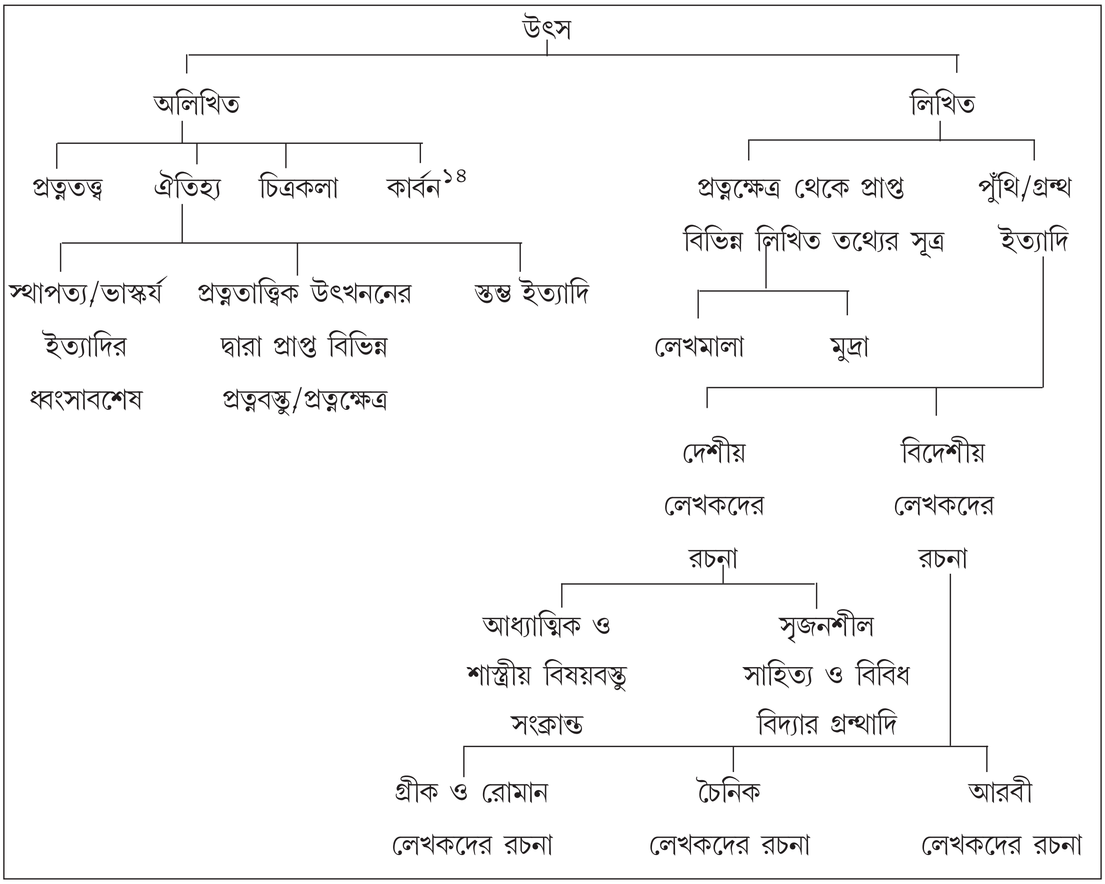

১.৩.১ লেখমালা

লেখমালার ক্রমাগত আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই। অতীত সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণায় লেখমালা একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। রাজারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়, ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা, শাসন পরিচালনা এবং অন্যান্য তথ্য লেখমালার মাধ্যমে জনসাধারণকে সরবরাহ করতেন; অপরদিকে লেখমালাতে সাধারণ লোকেরাও অনুপস্থিত নন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এখন অবধি প্রায় ৭০,০০০ লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ, নেপাল এবং বহির্ভারতেও এদের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী তৎকালীন সমস্ত প্রচলিত ভাষায় এগুলি লেখা হত, যেমন সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা যেমন তামিল, তেলেগু, কানাড়া, বৈদেশিক ভাষা যেমন গ্রীক ও আরামীয় (অ্যারামাইক) ব্যবহৃত হত। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখমালা শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নয়, সমকালীন ভারতীয় ভাষা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও অন্যতম সহায়ক।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও অবধি প্রায় ৭০,০০০ লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশাল লেখমালার এই

ভাণ্ডার স্বভাবতই একই শ্রেণীর হতে পারে না। চরিত্র অনুযায়ী লেখমালাসমূহকে আমরা প্রধান কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাজন করতে পারি।

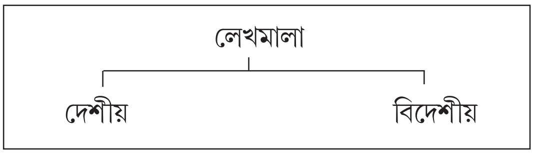

দেশীয় লেখমালা বলতে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত লেখমালাকেই বুঝব; বিদেশীয় লেখমালা বলতে আমরা বিদেশে প্রাপ্ত সেইসব লেখমালাকে বুঝব যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, লেখামালাকে বিভাজন করা সম্ভব।

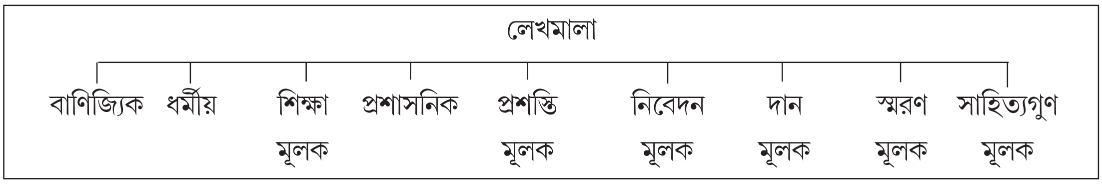

সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহরগুলির মধ্যে অনেকগুলিকেই বাণিজ্যিক পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির সিলমোহরগুলি ব্যক্তির নাম এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির লেখমালাগুলি বাণিজ্যিক পণ্যের নাম এবং কোথায় পাঠানো হচ্ছে তা নির্দেশ করত। হরপ্পীয় সিলমোহরে ধর্মভাবনার চিত্রও আভাসিত। তবে বাণিজ্যিক দলিল হিসাবে তাদের প্রাথমিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেহেতু হরপ্পা সভ্যতার লিপি এখনও অপঠিত তাই খুব জোরের সঙ্গে সিলমোহরগুলিকে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক লেখ বলা যাবে না। প্রাচীন যুগের বাণিজ্য নিগমগুলির নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার এবং বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নিজস্ব সিলমোহর ছিল। এদের অধিকাংশই অধুনালুপ্ত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আর্যদের আদি বাসস্থানের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আধুনিক ইরাক বা প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ায় ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের যে সকল লেখমালা পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাচীন ক্যাশাইটরা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সময় ভারত বিষয়ক এইসব লেখমালাকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

প্রশস্তিমূলক লিপিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে রাজা এবং তার রাজনৈতিক কার্যাবলী জড়িত থাকে। সে দিক দিয়ে দেখলে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু প্রশস্তি রচয়িতারা রাজ-অনুগৃহীত বলে নিরপেক্ষ সৎ ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। দৃষ্টান্ত হিসাবে কলিঙ্গের রাজা খারবেলের “হাতিগুম্ফা লেখমালা”, সমুদ্রগুপ্তের “এলাহাবাদ প্রশস্তি” ইত্যাদিকে উপস্থিত করা যেতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং তার সামরিক কৃতিত্ব বর্ণনা করায় লেখক এত মনোযোগী যে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির তিনি আলোচনাই করেননি। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনী ও কৃতিত্ব অনুধাবন করার প্রধান নির্ভরযোগ্য উপাদান এলাহাবাদ প্রশস্তি ও এরাণ লেখ। রাজা ভোজের “গোয়ালিয়র প্রশস্তি”-কে অপর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা চলে। অপর এক ধরনের প্রশস্তিমূলক লিপি পাওয়া যায় যেখানে রাজস্তুতি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা থাকে—যেমন শক রাজা উষ্যদন্ডের “নাসিক গুহালিপি”, সাতবাহন

বংশীয়া রানী গৌতমী বনশ্রীর "নাসিক প্রশস্তি" ইত্যাদি। উসবদাত শক রাজা নন, তিনি শক ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা মাত্র—নিজে কখনও শাসন করেননি। স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, নাসিক প্রশস্তির মাধ্যমেই সাতবাহনবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির রাজত্বের সবচেয়ে বিশদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়।

নিবেদনমূলক লিপি বলতে আমরা সেই সব লিপিকে বুঝব যেখানে দাতা উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু দান করছেন এবং ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের স্মরণের জন্য তিনি লেখমালা রচনার দ্বারা তাকে স্থায়ী করতে চান। "পিপ্রাওয়া লেখমালা"তে দেখা যায় যে ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস দান করা হচ্ছে এবং দাতা এই ঘটনাটিকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। গ্রীক নাগরিক "হেলিওডোরাসের" বেসনগর গরুড় স্তম্ভলিপি এই ধরনের লিপির অপর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যেতে পারে।

দানমূলক লিপির দৃষ্টান্ত অজস্র এবং অফুরন্ত। জমিদানের ক্ষেত্রে প্রায় সব পরিস্থিতিতেই এই লিপির ব্যবহার দেখা যায়। দানের বিষয়টিকে স্মরণীয় এবং বোধ হয় আইনগ্রাহ্য করার জন্যে এই লিপির ব্যবহার জরুরি ছিল। এ কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই লিপির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে লেখমালাকে আর একভাবে বিভাজন করা যায়—সরকারি লেখমালা এবং বেসরকারি লেখমালা। বেসরকারি লেখমালার প্রধান উৎস হচ্ছে এই দানমূলক লিপি।

জন্ম, মৃত্যু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্যে যে লেখ ব্যবহার করা হয় তাকে স্মরণমূলক লেখ-এর উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শন করার স্মারক হিসাবে সম্রাট অশোক এই লেখ উৎকীর্ণ করান।

অনুরূপভাবে কিছু কিছু লেখমালাকে আমরা সাহিত্য কীর্তির জন্যে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—আধুনিক উত্তরপ্রদেশের "মহানির্বাণস্তূপ" থেকে একটি তাম্রলিপি উদ্ধার করা গেছে, যার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের *উদানসূত্র* বিবৃত আছে।

মানব জাতির ইতিহাস কোন একটি বিশেষ জাতির দ্বারা বিশেষ সময়ে গড়ে ওঠে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি তাদের বিশেষ অবদানের দ্বারা মানব সভ্যতা গড়ার কাজে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার, ধর্মানন্দ কোশাম্ভবী এবং অন্যান্যরা মনে করেন যে, মানব সভ্যতায় ভারতের প্রাচীন যুগের অবদান অন্যান্য যুগের তুলনায় অনেক বেশী। অথচ এই যুগের কালানুক্রমিক কোন লিখিত ইতিহাস নেই। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ এই যুগ সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের অলিখিত বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি করে আসে লেখমালার উপর।

লেখমালার বিবরণ স্বতঃস্ফূর্ত ও সমসাময়িক। বিশেষ প্রয়োজনে স্থায়ী বস্তুর উপরে লেখা হয় বলে এর মধ্যে পরবর্তীকালে লেখকেরা হস্তক্ষেপ করতে পারেন না এবং প্রয়োজনে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করতে পারেন না। যদিও অনেক ক্ষেত্রে সন, তারিখের উল্লেখ থাকে না কিন্তু ব্রাহ্মী বা অন্যান্য ব্যবহৃত লিপির সময় নির্ণয়ের জন্য পুরালেখবিদ্যার (প্যালিওগ্রাফি) সাহায্যে বিশেষজ্ঞরা লেখ-তে ব্যবহৃত হরফের ভিত্তিতে লেখটির সময় নির্ণয় করতে পারেন। এদিক থেকে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে লেখমালা লিখিত পুঁথি/গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরজনক; কারণ লিখিত সাহিত্যের রচয়িতারাও অনেক ক্ষেত্রে সময় সম্বন্ধে মনোযোগী নন এবং বহু ক্ষেত্রেই মূল রচনাকে একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু এই কারণে যদি আমরা ভাবি যে লেখমালা

এবং লিখিত সাহিত্য পরস্পরের প্রতিপক্ষ তাহলে আমাদের চিন্তাকে অসম্পূর্ণ মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে লেখমালা এবং সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং সাহায্যকারী। লিখিত বিবরণের তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ-সহযোগে দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়, অন্যথায় প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণের লিখিত সমর্থন পাওয়া গেলে ইতিহাসের তথ্যকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ—হরপ্পা সভ্যতার শিলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাদের অনুসন্ধানকে যাচাই করতে পারেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিন্ধুসভ্যতা-সম্পর্কে নানারকম বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে; কিন্তু কোনরকম লিখিত প্রমাণের অভাবে তাদের চূড়ান্ত বলে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার বৈদিক সাহিত্যকে সাহিত্য থেকে ইতিহাসে উত্তীর্ণ করতে গেলে তা প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব বলে মনে হয়। চিত্রিত ধূসর পাত্রের অবস্থানের সাহায্যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায়। অন্যথায় ঋগ্বেদ-প্রমুখ গ্রন্থে ধাতব বস্তু ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রত্নক্ষেত্রে ঋগ্বৈদিক যুগে ব্যবহৃত ধাতুর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

লেখমালার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রসঙ্গটি আরও ভালভাবে বোঝা যাবে যখন ইতিহাসের পুনর্গঠন প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হবে। ইতিহাসের ঘটনাসমূহ স্থায়ী এবং তা অপরিবর্তনশীল। মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া ঘটনাকে পরির্তন করা যায় না। কিন্তু ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। দেশ, কাল, যুগ পরিবর্তনের ফলে মানুষের মন ও তার চিন্তা-ভাবনা সততই পরিবর্তিত হচ্ছে। উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সততই পরিবর্তন হয়; প্রতিটি যুগের ঐতিহাসিকেরা পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসকে নতুন করে লেখেন অর্থাৎ নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। চেতনার এই পরিবর্তনের ফলেই আমরা পুরাতন সমস্যাকে নতুন করে দেখতে এবং ভাবতে শিখি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার বহু উদাহরণ সহযোগে এই বিষয়টিকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করতে পারি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্তও পন্ডিত মহলে ধারণা ছিল যে, রাজকীয় গুপ্ত বংশ (ইম্পিরিয়াল গুপ্ত) স্কন্দগুপ্তের পরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৮ সালে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় এরাণ অঞ্চলে একটি ধ্বজস্তম্ভ পাওয়া গেল যেখানে ১৬৫ গুপ্ত অব্দে (অর্থাৎ ৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ) বুধগুপ্ত নামে বৃহৎ রাজার অধীনস্থ দু'জন ক্ষুদ্র রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৯৪ সালে ১৭৫ গুপ্ত অব্দে (৪৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে) বুধগুপ্ত প্রচলিত কিছু মুদ্রা পাওয়া গেল; দ্বিতীয় আবিষ্কারটি বুধগুপ্তের সময় এবং এলাকাকে প্রসারিত করল; ১৯১৪-১৫ সালে বারাণসীর নিকট সারনাথে দু'টি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেল; মূর্তি দু'টির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা গেল যে, ঐ মূর্তি দু'টি ১৫৭ গুপ্ত অব্দে (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজা বুধগুপ্তের রাজত্বকালে স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় আবিষ্কারটির দ্বারা প্রমাণ করা গেল যে, বুধগুপ্তের রাজ্যের সীমা পশ্চিমে মালব থেকে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং লেখমালা থেকে তার দীর্ঘ রাজত্বকালের কথা (৪৭৬-৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) জানা গেল। এখনও অবধি এই রাজার কোনও পরিচয় জানা সম্ভব হচ্ছিল না। এত বৃহৎ রাজ্যসীমার ফলে পণ্ডিতেরা তাকে গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছিলেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে তা করা যাচ্ছিল না। তৃতীয় দফায়, ১৯১৯ সালে অধুনা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর অঞ্চলের দু'টি তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হল। এই জমি ক্রয়/বিক্রয় সংক্রান্ত লিপিতে বুধগুপ্তের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। নর্মদা থেকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অবধি বিশাল অঞ্চল কোন স্থানীয় রাজার হওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

পণ্ডিতেরা তখন হিউ-য়েন-সাং উল্লিখিত "বুদ্ধগুপ্তে"র উল্লেখের কথা চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে, বুদ্ধগুপ্তকে শক্রাদিত্যের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বুদ্ধগুপ্ত/বুধগুপ্ত এক এবং অভিন্ন হতে পারেন, যেমন পারেন কুমারগুপ্ত/মহেন্দ্রগুপ্ত/শক্রাদিত্যের সঙ্গে। ১৯৪৩ সালে নালন্দাতে একটি ভগ্ন মৃত্তিকালিপি পাওয়া গেল যেখানে পরিষ্কারভাবে বুধগুপ্তকে গুপ্তরাজবংশের রাজা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং সমুদ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে অন্যান্য গুপ্ত রাজার সঙ্গে তাঁকে গুপ্ত বংশানুক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে। গুপ্তবংশের ইতিহাসে বুধগুপ্তের সংযোজনা প্রায় এককভাবে লেখমালার সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল; অন্যথায় লিখিত বিবরণীতে এই রাজার কোন উল্লেখ নেই; স্কন্দগুপ্তের পরেও গুপ্ত রাজবংশ দীর্ঘদিন সগৌরবে অব্যাহত ছিল এ কথা প্রমাণিত হওয়ার ফলে গুপ্ত রাজবংশের পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু করা যেতে পারে। ঠিক এইরকমভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশের ইতিহাস লেখমালার সাহায্যেই ধীরে ধীরে পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের বিশাল সামরিক কৃতিত্বের বিবরণ শুধুমাত্র লেখমালার সাহায্যে জানা সম্ভব। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযান সম্বন্ধে জানা যায়, যাদের সম্বন্ধে সমসাময়িক লিখিত বিবরণ একেবারেই নীরব।

এতদ্‌সত্ত্বেও লেখমালাকে আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠন করার সময় সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারি না, কারণ অধিকাংশ প্রশস্তিই আতিশয্য দোষে দুষ্ট এবং পরিমিত বোধহীন। কোন উপহার প্রেরণকে তারা অনেক সময় কর-প্রেরণের সঙ্গে এক করে দেখেন এবং বিদেশী রাজার সামান্যতম যোগাযোগ-প্রচেষ্টাকে বশ্যতা স্বীকার বলে মনে হয়। কোন রাজা বা রাজবংশ সামান্যতম প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই তার পূর্বপরিচয় বিস্মৃত হয়ে তাকে সূর্য বা চন্দ্র বংশের থেকে উদ্ভূত বলে দাবী করা হতে থাকে। তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তির কৃতিত্ব বর্ণনা করার সময় অতিরিক্ত আলংকারিক ও রূপক ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায় বা অনেক ক্ষেত্রেই মূল বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

স্থান ও কালকে ইতিহাসের দু'টি চোখ বলে বর্ণনা করা হয়। লেখমালায় প্রাপ্ত তারিখের সাহায্যে যেমন সময় নির্ণয় করা সম্ভব, সেই রকম লেখমালার প্রাপ্তিস্থান থেকে প্রাচীন স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। লেখমালার সাহায্যেই প্রাচীন লুম্বিবনীগ্রাম, কপিলাবস্তু, পুণ্ড্রবর্ধন, কৌশাম্ভবী, শ্রাবস্তী, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি স্থানের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান জানা সম্ভব হয়েছে। পিপরাওয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং প্রাপ্ত শিলমোহরের সাহায্যে কপিলাবস্তু সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সংশয় দূর হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের অদূরে রক্তমৃত্তিকায় প্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় যে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠেই এই বৌদ্ধবিহারটি অবস্থিত ছিল। এর ফলে সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-য়েন-সাং বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ সঠিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্য দিকগুলিও লেখমালার সাহায্যে আলোকিত হতে পারে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটি মূলত লেখমালার দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব। লেখমালার আলোকে গোষ্ঠীগুলি যথা শ্রেণী, গণ, সংঘ, নিকায় প্রভৃতির আর্থ-সামাজিক কার্যাবলী সম্পর্কেও তথ্য আহরণ সম্ভব। প্রাচীনকালে কারিগর শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিত। রাজন্যবর্গ সহ বিভিন্ন সমাজ স্তরের ব্যক্তিরা এদের থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদের বিনিময়ে অর্থ গচ্ছিত রাখতে পারতেন।

লেখ থেকে জানা যায় কারিগর পেশাদার গোষ্ঠীগুলি (‘শ্রেণী’ গণ’, ‘সংঘ’ ‘নিকায়’ প্রভৃতি—এগুলি বণিক সংগঠন নয়) রাজন্যবর্গ সহ বিবিধ ব্যক্তির কাছ থেকে চিরকালীন আমানত নিত ও তার উপর নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক সুদও (‘বৃদ্ধি’) দিত।

বণিক সংগঠনগুলির এই আধুনিক কার্যের বিবরণ নাসিক এবং মথুরা লেখমালা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখও লেখমালায় আছে যেমন ‘শ্রেণী গন্ডুভক দ্রম্ম’ (শ্রেণী গন্ডুভকের প্রচলিত মুদ্রা); ‘আদি বরাহ দ্রম্ম’ (প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের প্রচারিত রৌপ্য মুদ্রা)।

প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অজস্র বিবরণ লেখমালার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লেখমালাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত বিবরণের বক্তব্যকে সমর্থন করে। অশোকের লিপি থেকে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সামাজিক নেতৃত্ব, বর্ণবৈষম্য, গ্রীক অধ্যুষিত অঞ্চলে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের অনুপস্থিতি বিশদভাবে আলোচিত। অশোকের লেখ এবং মৈত্রক রাজার লেখ থেকে কায়িক পরিশ্রমরত ভৃত্য ও দাসদের বিবরণ পাই। ব্রাহ্মণ সাতবাহণ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নাসিক প্রশস্তিতে বর্ণসংকর ব্যবস্থা রোধ করার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টাকে সরবে প্রচার করেছেন এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্যে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন। লেখমালার মধ্যে রাজন্যবর্গের এই স্ববিরোধিতার উদাহরণ আরও মিলবে—যেমন শকদের সঙ্গে বিজয়পুরীর ইক্ষাকু পরিবারের সম্পর্ক অথবা ব্রাহ্মণ বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে অব্রাহ্মণ গুপ্ত রাজকন্যার বিবাহকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে। লেখমালা থেকে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় যা প্রাচীন সমাজব্যবস্থার একটি নতুন দিককে আলোকপাত করে। সেই বিষয়টি হল বিদেশীদের ভারতীয়করণ। পুণা-নাসিক অঞ্চলের শক শাসনকর্তা নহপানের জামাতা ঋষভ দত্ত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের অকাতরে অর্থদান করতেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণদের জন্য আশ্রয়-নিবাস নির্মাণ করেছিলেন। নগর গরুড়স্তম্ভলিপিতে তক্ষশিলার গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস নিজেকে “পরম ভাগবত” বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও সমাজব্যবস্থার অন্যান্য দিক যেমন ধর্ম, শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের জন্যে লেখমালার সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতীয় লেখমালাকে ঐতিহাসিকরা প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস বংশাবলীয় ইতিহাস শাসকদের পৌর্বাপর্য নির্ণয় ইত্যাদির জন্যেই বহুল ব্যবহার করতেন। ইদানীং লেখ-এর তথ্যগুলিকে প্রশাসনিক, আর্থসামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যেও নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে আদিমধ্যকালীন তাম্রশাসনগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাম্রশাসনগুলি মূলত জমি দানের দলিল। কোন্ শাসকের আমলে কোন্ অঞ্চল থেকে এগুলি জারী করা হয়েছিল এবং কোন্ এলাকায় প্রদত্ত জমি অবস্থিত ছিল, তার বিচার করলে ঐ শাসকের অধীনস্থ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক এলাকা অনুমান করা যায়। তাম্রশাসনের ভূমিকায় শাসক ও তাঁর পূর্বপুরুষদের বিবিধ রাজনৈতিক কীর্তি-কাহিনীর দ্বারস্থ রাজনৈতিক ইতিহাসের পুনর্গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তাম্রশাসনের মুখ্য অংশ—যেখানে জমি দানের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ হয়—দান গ্রহীতার পরিচয়, কোন্ ধর্মচারণের জন্যে ঐ ভূমিসম্পদ প্রাপ্ত, প্রদত্ত সীমাবর্ণনা, রাজপুরুষদের তালিকা, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উল্লেখ (যাঁদের ভূমিকা প্রায় সাক্ষীর মতো) বিবিধ করের তালিকা ইত্যাদি দেওয়া থাকে। প্রাচীন যুগের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অনুধাবনের জন্য এই তথ্যগুলির তাৎপর্য অপরীসীম। বহু ক্ষেত্রেই তথ্য বাস্তব অবস্থার ইঙ্গিতবহ। সেই কারণে কাব্যিক বর্ণনার তুলনায় তাম্রশাসনের তথ্য অনেক

ঐতিহাসিকের কাছে অধিকতর গ্রাহ্য। লেখমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আচার-আচরণকে অনুসরণ করে না। ভারতীয় সমাজ যে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা চালিত ও পরিবর্তন-বিহীন অনড়-অটল ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ লেখমালায় পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিকই, লেখমালায় প্রতিভাত সমাজে প্রধানত শাসকগোষ্ঠী উচ্চকোটির ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কথাই বেশি থাকে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি এই তথ্যসূত্রে যৎসামান্যই থাকে।

১.৩.২ মুদ্রা

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে লেখমালার পরেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মুদ্রা; কিন্তু অধ্যাপক পি. এল. গুপ্ত বোধহয় তা মানতে রাজী নন। কারণ তার মতে—মানব সভ্যতা শুরুর সময় থেকেই পণ্য-বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা হিসাবে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছে বলে মনে করতে হবে। ধাতব খণ্ডকে মূল্যমানের একক হিসাবে ব্যবহার করা ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রিঃপূঃ সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের আগে নেই। হরপ্পীয় সভ্যতায় শস্যকে বোধহয় মুদ্রার বিকল্প হিসাবে মনে করা হত। তবে কেউ কেউ ছোট ছোট শিলমোহরগুলিকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। ঋগ্বৈদিক যুগের পশুচারণ পরিবেশে গোরু ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের তুলনায় (ক) গোরুর স্থায়িত্ব অনেক বেশি, (খ) সহজেই নষ্ট হয়ে যায় না, (গ) খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করা যায়, (ঘ) সর্বোপরি অন্যান্য সম্পদের মতো গোরুর সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্রয়-বিক্রয়ে এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ে গোরু অচল, তাই পরবর্তী বৈদিক যুগেই "নিষ্ক" নামে এক অলংকারের কথা শোনা যায়। নিষ্ক শব্দটি বহু পরবর্তীকালে স্বর্ণমুদ্রার সমার্থক হলেও পরবর্তী বৈদিক আমলেও ঐ অর্থই বোঝাত কিনা, সন্দেহ আছে। কারণ ঐ আমলের মুদ্রার কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে এখনও অজানা। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য 'কৃষ্ণল' (১.৮ গ্রেণ) নামক এক তৌলরীতির উল্লেখ আছে। একশ'টি কৃষ্ণলের সমান ছিল 'শতমান' (অর্থাৎ ১.৮ x ১০০ = ১৮০ গ্রেণ-এর একটি তৌলরীতি)। এই তৌলরীতি কিছুকাল পর থেকে ধাতবমুদ্রা নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখা যায়। নিশ্চিত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় প্রাচীনতম ভারতীয় মুদ্রাভাণ্ডার পাওয়া যায় তক্ষশিলা ও কাবুলের নিকটস্থ চমা-ই-হুজুরী থেকে। এই দুই মুদ্রাভাণ্ডারের প্রাচীনত্ব খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতকের আগে স্থাপন করা দুরূহ। (এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য—ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, টাকাকড়ি আবির্ভাবের যুগ)। সুতরাং ১৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৮০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণা, নানা স্তরের লোকদের নানারকম অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। অধ্যাপক গুপ্তের মতে, প্রাচ্য দেশের চীন এবং পশ্চিমের লিবিয়ার চেয়ে অন্তত এক শতাব্দী পূর্বে ভারতে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রথমেই প্রাচীন মুদ্রাকে দেশীয় ও বিদেশীয় এই দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। আবার ধাতব খণ্ড হিসাবে ভাগ করে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার প্রাপ্তিস্থানের বিস্তৃতি এবং প্রাপ্ত মুদ্রার ধারাবাহিকতা জানবার জন্যে আমরা মুদ্রাগুলিকে যুগ অনুযায়ী ভাগ করতে পারি। এছাড়াও প্রাচীন যুগের মুদ্রাকে প্রধানত দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) গুপ্তপূর্ব যুগের চিহ্ন অঙ্কিত মুদ্রা এবং (খ) গুপ্ত সম্রাটদের প্রচলিত মুদ্রা। গুপ্ত উত্তর যুগের মুদ্রাকে অঞ্চলভিত্তিক ভাবে (ক) সৌরাষ্ট্র ও মালবের মুদ্রা (খ) দক্ষিণাপথের প্রাচীন মুদ্রা (গ) উত্তরাপথের মধ্যযুগের মুদ্রা এবং (ঘ) পশ্চিম

সীমান্ত ও মধ্যদেশ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। বিদেশীয় মুদ্রাকে প্রধানত (ক) গ্রীক রাজগণের মুদ্রা (খ) শক রাজগণের মুদ্রা (গ) কুষাণ বংশীয় রাজাদের মুদ্রা (ঘ) জনপদ ও গুণসমূহের মুদ্রা—এই ভাগ করা যেতে পারে। ভারতীয় মুদ্রাকে আবার (ক) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে প্রচলিত মুদ্রা (খ) বেসরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মুদ্রা—এ ভাবেও ভাগ করা যায়।

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রচলিত বলে মুদ্রা রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা সত্ত্বেও খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর আগের কোন মুদ্রা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা পাওয়া যায়নি, যদিও সাহিত্যে আমরা খ্রিঃপূঃ সপ্তম শতাব্দী থেকেই মুদ্রার উল্লেখ পাচ্ছি; দ্বিতীয়ত উল্লিখিত সময়ের কোন স্বর্ণমুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে চতুষ্কোণ ও গোলাকার প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলিই বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত কাহাপণ বা কার্যাপণ। এই মুদ্রায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়; কোন নাম বা তারিখ উল্লেখ থাকে না বলে কে কবে মুদ্রাটির প্রচলন করেছেন তা বোঝা যায় না। বহুদিন পর্যন্ত ধারণা করা হত যে এই মুদ্রাগুলি বোধহয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচলিত হত, কিন্তু এখন মগধের সম্রাটগণের প্রচলিত মুদ্রাগুলির সঙ্গো ক্ষুদ্র জনপদের শাসকদের প্রচলিত মুদ্রার পার্থক্য করা সম্ভব। গ্রীক জাতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় রাজারা মুদ্রায় নানারকম পরিবর্তন করেন। খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতকের গোড়ায় ব্যাকট্রীয় গ্রীক রাজাদের মুদ্রাতেই সর্বপ্রথম রাজার মূর্তি ও নাম সম্বলিত মুদ্রা ভারতে পাওয়া যায়।

লেখমালার মতো মুদ্রার সাহায্যেও ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হলে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইন্দো-গ্রীকদের সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। শুধুমাত্র মুদ্রার সাহায্যেই ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব। যেমন মুদ্রার সাহায্যে জানা যায় যে রাজা ডিমিট্রাস হচ্ছেন প্রথম গ্রীক শাসক যিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য তিনি দ্বিভাষিক মুদ্রার প্রচলন করেন; রাজা মিনান্দারের মুদ্রার বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন স্থানে তার প্রাপ্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সমস্ত ভারতীয় গ্রীক রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শক্তিশালী। শুধুমাত্র মুদ্রার সাহয্যে আটত্রিশ জন ভারতীয়-গ্রীক রাজা এবং দু'জন রানীর নাম জানা সম্ভব হচ্ছে; এদের মধ্যে মাত্র দু'জনের নাম লেখমালায় এবং সাত জনের নাম সাহিত্যিক বিবরণীতে আছে। মুদ্রার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে হেলিও ক্লেস শেষ ভারতীয়-গ্রীক রাজা এবং তার পরেই ভারতে গ্রীক রাজ্য বিলপ্ত হয়ে যায়।

ঠিক অনুরূপভাবে শক-পহ্লব বংশের পঞ্চাশ জন শাসকদের একটি কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা মুদ্রার সাহায্যে করা সম্ভব। উজ্জয়িনীতে চন্টন প্রতিষ্ঠিত শকবংশ প্রায় তিন শত বৎসর রাজত্ব করেছিল। এদের বংশানুক্রমিক এবং কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করার ব্যাপারে মুদ্রার সাহায্য আবশ্যকীয়। কারণ মুদ্রাগুলিতে রাজার নাম, তারিখ এবং কোন কোন সময় রাজার পিতার নাম এবং তাঁর অভিধাও বর্ণনা করা আছে। সিংহাসন নিয়ে কহল, দ্বন্দ্ব এবং ফলস্বরূপ একজন বহিরাগতের সিংহাসন অধিকার—সমস্তই মুদ্রার সাহায্যে জানা যায়। কুষাণ মুদ্রার আলোচনা বাদ দিলে কুষাণ বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের পুনর্গঠন মুদ্রার সাক্ষ্য কতটা জরুরী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাসিকের নিকটস্থ জোগলথেম্বীর মুদ্রাভাণ্ডার। এই মুদ্রাভাণ্ডারে

বহুল পরিমাণে শক ক্ষত্রপ নহপানের মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু নহপান এর মুদ্রার উপর গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির নাম, নকশা, ও প্রতীক পুনর্মুদ্রিত হয়। এর দ্বারা গৌতমীপুত্রের হাতে নহপানের পরাজয়ের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল— যে ঘটনা লেখামালার সাক্ষ্যেও সমর্থিত হয়।

দেশীয় রাজাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর স্বল্প পরিচিতি মিত্র বংশের নাম করতে পারি। পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এরা রাজত্ব করতেন; মাত্র দু'টি বা তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তাদের ইতিহাস মুদ্রা ছাড়া অপর কোন উৎস থেকে জানা সম্ভব নয়। গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে লিচ্ছবীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন; কুমারদেবী এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্তের যৌথমুদ্রা বোধহয় সেই ইঙ্গিত বহন করে। মুদ্রা ছাড়া অপর কোন উৎস থেকে আমরা এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না।

ঐতিহাসিকরা মুদ্রার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলেছেন যে কুমারদেবী কি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় মেরীর মতো প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাথে যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করতেন? কাশ্মীরেও রাজা ক্ষেমগুপ্ত ও রানী দিদ্দার নামে প্রচারিত যৌথ মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক কলহণ এই ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দিতে চাননি; কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে রানী দিদ্দা নিজের নামে মুদ্রা প্রচার করছেন; পরবর্তীকালে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছেন। গুপ্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবর্তন করলে দেখতে পাব যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক শক শাসনের উচ্ছেদ, বিক্রমাদিত্য কিংবদন্তী সমস্তই সম্রাট কর্তৃক প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে বোঝা যায়। সুতরাং গুপ্ত প্রশাসনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও মুদ্রাকে কাজে লাগানো যায়। ৩৯৭ খ্রিস্টাব্দের পরে পশ্চিম ভারতে কোন শক মুদ্রা পাওয়া যায়নি যা শক শাসনের পতনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে।

মুদ্রাতত্ত্ববিদ্দের মতে, কাশ্মীরই বোধহয় ভারতের একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে দু'টি-একটি বিক্ষিপ্ত সময় ছাড়া প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে বারো শত বৎসরের মুদ্রার ইতিহাস জানা যায়। কাশ্মীরের মুদ্রা উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলেও অনেক সংখ্যায় পাওয়া গেছে যার দ্বারা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কথা জানতে পারি।

প্রাচীন ভারতের অরাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্বও মুদ্রার সাহায্যে জানা যায়। কোন কোন স্থানে "যৌধেয় গণম্য" অথবা "মালবগণস্যজয়" ইত্যাদি লেখা মুদ্রা দেখতে পাওয়া যায়। "অর্জুনায়ন", "বৃমতী" এবং অন্যান্য মুদ্রা সুনিশ্চিতভাবে প্রজাতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এদের মুদ্রা থেকে বোঝা যায় যে রাজকীয় সার্বভৌমত্ব কোন একটি ব্যক্তির উপর নয়; সামগ্রিক সংগঠনের উপর অর্পিত হত। তক্ষশীলা অঞ্চলে প্রাপ্ত "নিগম" ধরনের মুদ্রা থেকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শহরগুলি বিশেষ ধরনের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ভোগ করত বলে মনে হয়। সাংবিধানিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে শক-কুষাণ মুদ্রাগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রশাসনের স্তরে রাজা এবং তার পরিবারের লোকেরা যুক্ত থাকতেন। উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত শক-মুদ্রা থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে রাজপুত্রেরা ক্ষত্রপ হিসাবে মহাক্ষত্রপদের অধীনে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন এবং তারা মহাক্ষত্রপ নিযুক্ত হলে পুত্রদের ক্ষত্রপ পদে নিযুক্ত করতেন।

রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়াও অর্থনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম। মুদ্রা প্রধানত ও প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট তৌলরীতিতে নির্মিত ও ধাতুগত বিশুদ্ধি-সমন্বিত ধাতব বিনিময় মাধ্যম। অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এখনও অবধি মুদ্রাকে

উৎস হিসাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কারণ মুদ্রা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অনুমানমূলক। খুব সাধারণভাবে দেখলে মুদ্রার ব্যাপক উপস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অপরদিকে মুদ্রার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক স্থবিরতার পরিচায়ক। সুতরাং সাধারণভাবে দেখলে মুদ্রা থেকে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক মান নির্ণয় করা সম্ভব। নন্দদের ও মৌর্য দ্বারা প্রচলিত চিহ্ন অঙ্কিত মুদ্রাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়; আফগানিস্তান অবধি তাদের গতি বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ভারতের অর্থনীতিতে মুদ্রা-অর্থনীতি প্রচলনের কৃতিত্ব মৌর্যদের প্রাপ্য বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। মৌর্যদের পতনের পরে আফগানিস্তানের উপর ভারতীয়দের কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়ে গেলে ভারতে রূপার যোগানের ঘাটতি দেখা যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে রৌপ্য মুদ্রার প্রাচুর্য দেখা যাবার পর পরবর্তীকালে এর যোগানে কিছুটা মন্দা থেকে যায়। কুষাণরা একাধিক উৎকৃষ্ট স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছেন; যা তারা ভারত-রোম বাণিজ্য বা মধ্য এশিয়া বা ভারতের অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করতেন। কুষাণ মুদ্রা ইথিওপিয়াতে পাওয়া গিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে কুষাণ মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দেয়। ভারত-রোম বাণিজ্যের অন্যতম অংশীদার দক্ষিণ ভারতের সাতবাহনরা সমৃদ্ধশালী শক্তি হয়ে উঠেছিনেল। নাসিক লেখমালায় বিদেশী মুদ্রার উপস্থিতি এবং দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়যোগ্যতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ ভারত থেকে রোমিক মুদ্রার আবিষ্কার রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের দূর পাল্লার বাণিজ্যের স্পষ্ট পরিচায়ক। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনদের সময় রোমান মুদ্রা দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি অর্থনীতিতে বিরাজ করত। ভারতে রোম বাণিজ্য যতদিন অব্যাহত ছিল ততদিন পর্যন্ত ভারতের স্বর্ণমুদ্রার যোগানে বোধহয় কোন সমস্যা হয়নি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে ভাটা পড়ে। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা গুপ্ত যুগে ভারত-চীন বাণিজ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চীন ভারত থেকে সুতিবস্ত্র, শর্করা (চিনি) এবং অন্যান্য জিনিসের আমদানি করত এবং এর বিনিময়ে ভারতের স্বর্ণের যোগান সম্ভব হত। ভারত-রোম বাণিজ্যের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যেত সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এইসব জিনিসের উৎপাদন নিজেরা শিখে নিল, ভারতের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমে গেল; ফলস্বরূপ ভারতের স্বর্ণমুদ্রা আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। গুপ্ত উত্তরকালে ভারতে মুদ্রার সঙ্কট এবং একটি সীমাবদ্ধ সংকুচিত অর্থনীতির সৃষ্টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গুপ্ত উত্তরকালে পাল ও রাষ্ট্রকূটদের পক্ষেও কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করা সম্ভব হয়নি। অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বিচার করতে মুদ্রার অসীম সম্ভাবনা আছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। মুদ্রা নির্মাণে নির্দিষ্ট তৌলরীতির ব্যাপক পরিবর্তন এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার খাদের পরিমাণ বিচার করে ঐতিহাসিকরা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক (বিশেষত বাণিজ্যিক) উন্নতি বা মন্দার চিত্র দেখাতে সক্ষম।

মুদ্রায় বহুক্ষেত্রেই মুখ্য দিকে শাসকেরা প্রতিকৃতি (রাজকীয় উপাধিসহ) থাকে, গৌণ দিকে বিবিধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত থাকে। মুদ্রার মাধ্যমে, বিশেষত কুষাণ ও গুপ্ত আমলে, রাজার প্রতাপ ও প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রচার করা হত। কুষাণ আমল থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত মুদ্রা জারি করা শাসকদের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করা চলে।

এ ছাড়াও মূর্তি চর্চা এবং শিল্প চর্চার ক্ষেত্রেও মুদ্রাকে ব্যবহার করা হয়। প্রথম দিকের ভারতীয় মুদ্রায়

মনুষ্যমূর্তির নির্মাণে কোন দক্ষতা বা রুচির ছাপ পাওয়া যায় না। ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের মুদ্রায় খোদিত মনুষ্যমূর্তিকে আমরা প্রাচীন যুগের শিল্পের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলতে পারি। অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও শুধুমাত্র মূর্তির ছবি দ্বারা তাদের পারিবারিক রক্তের সম্পর্ক অনুমান করা সম্ভব। শক-পহ্লবদের মুদ্রায় এই উন্নত শিল্পকৌশল অনুপস্থিত, কিন্তু পরবর্তীকালের কুষাণ মুদ্রায় উন্নত শিল্প নমুনা দেখা যায়। বাস্তবিক, কুষাণরা বহু দেবদেবীকে মানবী মূর্তিরূপে উপস্থিত করেছেন। গুপ্তরা বিদেশীয় শৈলীকে আত্মস্থ করে মুদ্রা নির্মাণ শিল্পের সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক পি. এল. গুপ্ত., গুপ্ত মুদ্রাকে কুষাণ মুদ্রার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। মৌলিকত্বের বিচারে গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার তুলনা মেলা ভার।

১.৩.৩ স্থাপত্য/ভাস্কর্য ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ

স্থাপত্য/ভাস্কর্য এবং মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষকে আমরা বাস্তবভিত্তিক উপাদান বলতে পারি। এখানে কোন কৃত্রিমতা নেই, কোন জালিয়াতির অবকাশ নেই। প্রত্নবস্তুকে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা বিশেষজ্ঞের কাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত এই সব কাজ প্রায় অনভিজ্ঞ অথচ উৎসাহী সংগ্রাহকরা করতেন। ১৮৬১ সালে স্যার আলেকজেন্ডার কানিংহাম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রত্নবস্তু উদ্ধারের কাজ শুরু হয়।

১৯০২ সালে স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে প্রত্নবস্তু উদ্ধার এবং তা বিশ্লেষণের কাজে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সাঁচী, তক্ষশীলা, সারনাথ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ স্তম্ভ, ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বাস্তব দিকটি সভ্যজগতের কাছে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পীয় সভ্যতা আবিষ্কারকে বিবেচনা করতে পারি। ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথম একটি নাগরিক সভ্যতা আবিষ্কৃত হল। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব বেশ কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেল। স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হরপ্পীয় সংস্কৃতিকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত করল। অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ বোধহয় খ্রিঃপূঃ নবম থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাপ্ত ধূসর রঙের চিত্রিত মৃৎপাত্রগুলি। এই মৃৎপাত্রগুলির আবিষ্কার ভারতবর্ষে লৌহ যুগ এবং আর্যদের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সংস্কৃতি বিস্তারের মধ্যে এক সমীকরণ ঘটাতে সম্ভব করেছে। প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্নবস্তু নিয়ে আলোচনার শেষ নেই এবং স্বল্প পরিসরে প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এইটুকু বলা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আধুনিককালে যে আলোচনাই হোক না কেন তাতে পুরাস্তু প্রমাণ ও উল্লেখ প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে।

পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত কার্বন^{১৪} পদ্ধতি নিজে উৎস নয়, কিন্তু উৎসকে পরীক্ষা করার জন্যে আধুনিককালে প্রায় অপরিহার্য। যে কোন জৈব পদার্থে কার্বন পরমাণুর অবস্থিতির দ্বারা কুড়ি হাজার বছরের নির্মিত পদার্থের তারিখ এবং বয়ঃসীমা নির্ণয় করা সম্ভব। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় কার্বন^{১৪}-এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে; আবার উদ্ভিদ জীব-জন্তুর খাদ্য। সুতরাং খাদ্য হিসেবে প্রাণীরা যখন এই উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন পরোক্ষভাবে কার্বন^{১৪}-এর পরমাণুগুলি প্রাণীদেহে প্রবেশ করে।

জীবজন্তু ও মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তাদের দেহ থেকে কার্বন^{১৪} নির্গত হতে থাকে। নানা গবেষণার

পর বিজ্ঞানীরা মৃত প্রাণীর দেহ থেকে কত পরিমাণ কার্বন১৪ নির্গত হয় কত অবশিষ্ট থাকে তা হিসাব করতে সমর্থ হয়েছেন।

মৃত বস্তুর দেহে অবস্থিত কার্বন১৪ পরমাণুর পরিমাণ থেকে জানা যায় বস্তুটি কত পুরাতন। এই কার্বন১৪ পদ্ধতির সাহায্যে পূর্ব শতাব্দীর যে কোন বস্তুর তারিখ নির্ধারণ করা যাবে; সেইজন্যে বলা হয়ে থাকে "Carbon^{14} is called the measuring rod of antiquity"—যে কোন জৈববস্তুর প্রাচীনত্ব নির্ণয় করার মানদণ্ডস্বরূপ।

১.৩.৪ পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখনন

পুরাতত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, যেসব যুগে ইতিহাসের লিখিত উপাদান নেই বা অতি সামান্য (তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক/প্রায় ঐতিহাসিক যুগ), সেই সব সময়ের কথা জানার জন্যই ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎখনিত "পাথুরে প্রমাণ" বিশেষভাবে উপযোগী। এই ধারণা এখন অনেকটাই ভিন্নতর। যে আমলে লিখিত তথ্যসূত্র নেই সেই আমলের জন্যে তো বটেই, কিন্তু যে যুগে লিখিত তথ্যসূত্র উপস্থিত সেই সময়ের ইতিহাস বোঝার জন্যও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদির গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে খ্রিঃপূঃ ৬০০ থেকে খ্রিঃ ৩০০ পর্যন্ত নগরজীবনে যে প্রাণবন্ত সম্প্রসারণশীল চরিত্র দেখা যায়, তার জন্যে কেবলমাত্র লিখিত বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান ও উৎখননের দ্বারা নগরজীবনের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। নগরের আয়তন, প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার আয়তন, নগরের বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, জলনিকাশী ব্যবস্থা, ইঁটের মাপ, নানাবিধ মৃৎপাত্র সহ নগরবাসীর ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নগরের যে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা চলে, প্রথাগত সাহিত্যিক বর্ণনায় (এই উপাদানের গুরুত্বও কম নয়) তা সব সময়ে ধরা পড়ে না। নগরের বিকাশ ও অবক্ষয় দুই বুঝতেই পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ বিশেষভাবে সহায়ক।

১.৪ সাহিত্যগত তথ্যসূত্র

ঐতিহাসিক বিচারে লিখিত উৎসকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। এখানে লেখক সচেতনভাবে তার বক্তব্যকে উপস্থিত করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের উপস্থিতির জন্যে গ্রীক ও রোমের ইতিহাস লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা সম্ভব, কিন্তু লিখিত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা বোধহয় নিরাপদ নয়।

অলিখিত উৎসের মতো লিখিত উৎসকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

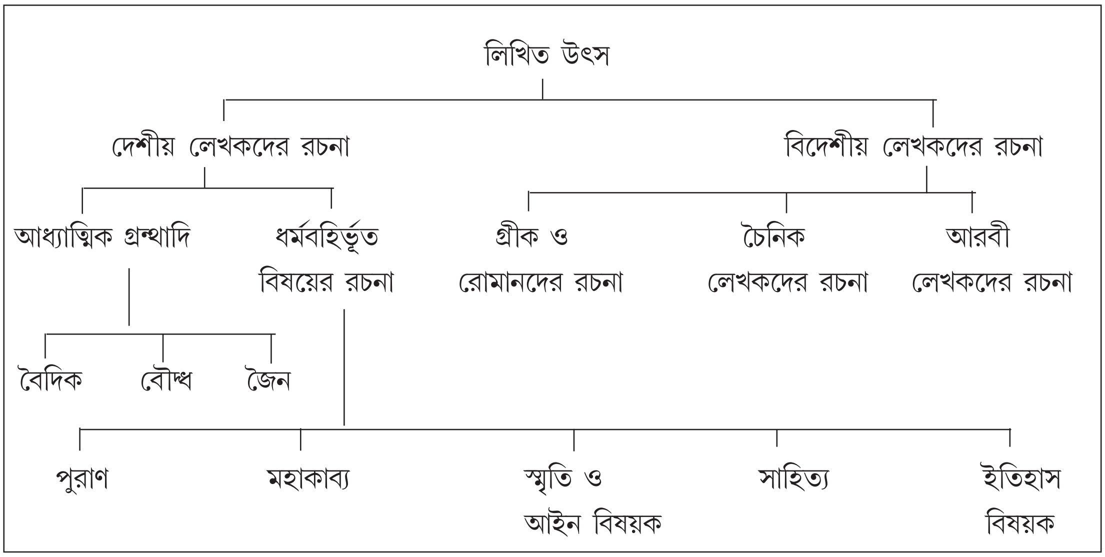

আর্যদের থেকে সাহিত্যগত বিবরণের সূচনা বলা যায়। আর্যদের সম্বন্ধে জানবার প্রধান উৎস চতুর্বেদ। আর্যরা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃপূঃ ভারতে আসেন এবং ১৪০০ খ্রিঃপূঃ থেকে বেদ রচনা শুরু হয়। ১৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃপূঃ অবধি প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উৎস হল বৈদিক সাহিত্য। *ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব* এই চারটি বৈদিক সংহিতা এবং প্রাচীনতম হল ঋগ্বেদ। এখানে প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের তথ্য খোঁজা বৃথা; কিন্তু পরোক্ষভাবে কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদগ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে আর্যদের অভিপ্রয়োজনের কোন উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য বহু দূর অবস্থিত একটি বাসভূমির কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করার উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য বহু দূর অবস্থিত একটি বাসভূমির কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই উল্লেখ পরোক্ষভাবে অভিপ্রয়াণের তত্ত্বকে সমর্থন করে। এ ছাড়া অপর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হল "দশরাজার যুদ্ধ"। এই যুদ্ধ আন্তঃ উপজাতীয় সংঘর্ষের একটি নমুনা। উদাহরণকে বহু দূরে বিস্তৃত না করে আর একটি উদাহরণ *শতপথ ব্রাহ্মণ* থেকে দেওয়া যায়। সেটি হল বিদেঘ মাঠরের অগ্নিবৈশ্বানরকে অনুসরণ করে সরস্বতী নদীর তীর থেকে (বর্তমান হরিয়ানা) পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া। এটি কি পরিষ্কারভাবে আর্য সভ্যতার পূর্বদিকে প্রসারের উল্লেখ নয়? সর্বোপরি বৈদিক সাহিত্যের ধারাবাহিকতা থেকেই প্রায় এক হাজার বছরের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে পুনর্গঠন করতে হবে, কারণ এই যুগ পূর্ববর্তী হরপ্পীয় সভ্যতার মতো প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ নয়। *অথর্ববেদ*-এ একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সুস্পষ্ট উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। জাতিভেদ প্রথা আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা। বৈদিক আর্যদের সৃষ্ট সমাজব্যবস্থায় এই সমস্যা প্রতিপালিত হয়েছে এবং দেশ, কাল, সময় অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই মনে করেন যে সমসাময়িক অন্যান্য লিখিত উৎস থেকে তথ্যকে সরাসরি গ্রহণ না করে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তথ্যগুলিকে গ্রহণ করা উচিত। সমসাময়িক অন্যান্য

গ্রন্থের তুলনায় বেদের ঐতিহাসিকতা তাঁর মতে অনেক বেশি। ভারতীয় দর্শনের বিবর্তনে বৈদিক সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য নিয়ে পূর্বে বহু আলোচনা করা হয়েছে এবং এখনও হয়। কিন্তু সব কিছু বলা সত্ত্বেও বৈদিক সাহিত্য রচয়িতাদের ইতিহাস-দর্শনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে পারা যায় না। বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা (যেমন আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষ এবং পরিণামে আর্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল) তাঁরা উপেক্ষা করেছেন বা এড়িয়ে গেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই সময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখতে গেলে বহু অনিশ্চয়তা ও ফাঁক এসে পড়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের আলোকে আমাদের বৈদিক যুগ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব; কিন্তু স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট সামাজিক আচরণকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অব্যাহত রাখা তাদের অন্যতম কৃতিত্ব। বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয়রা প্রাচীন ভারতীয় যুগের সঙ্গে যোগ রাখতে পারেন, যে যোগসূত্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনুপস্থিত।

বৈদিক সাহিত্যের ভাণ্ডার যেখানে শেষ হয়, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য সেখান থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে করতে হবে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাহিত্য রচয়িতারা বৈদিক সাহিত্যকারদের চেয়ে পার্থিব বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বৌদ্ধসাহিত্য অনেক বেশি সমাজ-সচেতন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সাহিত্যেই খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ষোড়শমহাজন পদের বর্ণনা আছে যা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় অন্যতম সহায়ক। অবশ্য কোন বৌদ্ধ গ্রন্থই বুদ্ধের সমকালীন নয়। জৈন গ্রন্থগুলি আরও পরে রচিত, কিন্তু পরবর্তী আমলের রচনা হলেও খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের স্মৃতি এই সাহিত্যে বিবৃত বলে পণ্ডিতদের ধারণা। *দীর্ঘনিকায়* এবং *অঙ্গুত্তর নিকায়* গ্রন্থে মগধের রাজনৈতিক উত্থানের বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থ *গভবতী* সূত্রতে খ্রিঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ষোড়শমহাজনপদের একটি বিকল্প তালিকা খুঁজে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রর লেখা *পারশির্ষ পার্বণ* মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। ভদ্রবাহু রচিত *জৈনকল্পসূত্র* গ্রন্থে জৈনধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

১.৪.১ পুরাণ

পূর্বেকার ব্রিটিশ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা পুরাণকে ভারতীয় ইতিহাসের উৎসরূপে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন। পুরাণকে তারা কতকগুলি অবিশ্বাস্য গল্পকথার সংকলন বলে মনে করতেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। রাজবংশের ইতিবৃত্তের বাইরে ঐতিহাসিকেরা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের আকর তথ্য হিসাবে পুরাণের উপযোগিতা স্বীকার করেন। বিশেষত আদি মধ্যযুগে (খ্রিঃ ৬০০-১৩০০) ভক্তিবাদ আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ ধর্মসম্প্রদায়গুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্থানীয় ও কালগত বৈচিত্র্য, দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন আদর্শ ও মূর্তিতত্ত্বের আলোচনার জন্যে পুরাণের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এখন পুরাণকে পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যগত সূত্র বলে দাবী করা হয়।

পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। পুরাণের মধ্যে রাজাদের বংশ তালিকা, তাদের কার্যাবলী, রাজাদের নাম পাওয়া যায়; সেইদিক থেকে দেখলে পুরাণকে ক্ষত্রিয়দের প্রতিনিধিমূলক সাহিত্য বলা যায়। পুরাণের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণের বক্তব্য বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এমন কী, প্রত্নতাত্ত্বিক বক্তব্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। পারজিটার প্রথম পুরাণের বিভিন্ন বক্তব্যগুলিকে সুসংহত করে ইতিহাসের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি এবং তার পরবর্তী

গবেষকরা এই কাজে বিশেষ সফল হননি; আবার অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক সাহিত্যের বক্তব্যের সঙ্গে পুরাণের বক্তব্যের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখা যায়; মতবিরোধ ঘটলে অধ্যাপক রমেশ মজুমদারের মতে পুরাণের বক্তব্যকে বৈদিক সাহিত্যের আলোকে বিচার করা উচিত।

১.৪.২ মহাকাব্য

দেশীয় সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দু'টি মহাকাব্য। সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের জন্য এদের অবদান অনস্বীকার্য। দু'টি গ্রন্থতেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনাকে বিশাল এক চালচিত্রের মধ্যে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চালচিত্রের পরিধি এত বড় যে প্রকৃত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এর পশ্চাতে না থাকলে এই বই শুধুমাত্র কল্পনার ভিত্তিতে লেখা সম্ভব নয়। রামায়ণ-এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামের রাজ্য জয় এবং সুশাসনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আর্য সভ্যতা বিস্তার এবং সংহতকরণের একটি ছবি ফুটে ওঠে। মহাভারত রামায়ণ-এর চেয়েও বহু বিতর্কিত একটি গ্রন্থ। বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু "মহাভারতের যুদ্ধের" কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা; যদি এই মূল্য প্রমাণিত হয় তাহলে মহাভারতকে আর ধর্মীয় গ্রন্থ বলা যাবে না এবং এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে আরো গবেষণা করা সম্ভব।

প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হয় যুদ্ধটিকে কেন্দ্র করে। বৈদিক সাহিত্য রচয়িতারা মহাভারত-এ কথিত বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন কুরু, পঞ্চাল, ভরত ইত্যাদি নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র স্থানটিকে তারা পুণ্যক্ষেত্রবলে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু কোথাও এখানে যুদ্ধ হয়েছিল বা এই গোষ্ঠীর লোকেরা রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। তাহলে খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃপূঃ ৬০০ অব্দের মধ্যে কোন্ সময় যুদ্ধ ঘটেছিল? কিন্তু মহাভারত-এর ঐতিহ্য ভারতীয় জনমানসে এত গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ যে পরবর্তীকালে বহু লেখক তাদের গ্রন্থে মহাভারত-এর যুদ্ধের কথা বার বার বলেছেন। মহাভারত-এর সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক উল্লেখ (খ্রিঃপূঃ ৬৩৭) আইহোল লিপিতে পাওয়া যায়, যেখানে লেখক নিজস্ব গণনার পদ্ধতিতে বলেছেন, মহাভারত যুদ্ধের পর ৩৭৩৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আরও পুরাতন উৎস *কথাপুরাণ*-এ পরীক্ষিতের জন্মের তারিখের সঙ্গে মহাপদ্ম নন্দের সিংহাসন আরোহণের ব্যবধান নির্ণয় করা হয়েছে। যেহেতু তারিখটির পাঠনির্ণয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে তাই হিসাব অনুসারে মহাভারতের তারিখ ১৯০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ১৪৫০ খ্রিঃপূর্বাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, মহাভারতের সভ্যতার কোন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে এক ধরনের বিভ্রান্তি থেকেই যায়। ১৯৫০-৫২ সালে হস্তিনাপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহ্য অনুসারে পরীক্ষিতের বংশের প্রধান শাখা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতে থাকেন এবং পরীক্ষিতের বংশের ষষ্ঠতম উত্তর পুরুষ ছিলেন নিক্ষাকশু। পুরাণের বক্তব্য অনুসারে নিক্ষাকশুর রাজত্বকালে হস্তিনাপুরে মহাবিপর্যয় ঘটে। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এও মহামারী ও শস্য ধ্বংসের কথা লেখা আছে। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এক মহাপ্লাবন যা হস্তিনাপুরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিক্ষাকশু হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করে কোশাম্বীতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

হস্তিনাপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা মাটির তলে পাঁচটি স্তর পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে একটি মহাপ্লাবনের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এই প্লাবনের পরই যে শহরটি পরিত্যক্ত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট নয়। মহাভারত-এর ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য আমাদের আরও প্রত্নবস্তু এবং আরও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

১.৪.৩ আইন ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

স্মৃতি ও আইন বিষয়ক গ্রন্থগুলি সমসাময়িক যুগের সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজে বিশেষ সহায়ক। এই পর্যায়ের আইন ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*। *অর্থশাস্ত্রকে* কেন্দ্র করে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা থাকলেও এ থেকে মৌর্যদের কেন্দ্রাভিগ আমলাতন্ত্রের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। কৌটিল্লীয় *অর্থশাস্ত্র*-এ প্রশাসন চালাবার জন্যে উপদেশগুলি মৌর্য আমলে বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এই শাস্ত্রের বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। রাষ্ট্রপরিচালন ক্ষমতা দখল ও সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে অর্থনীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—এইগুলি *অর্থশাস্ত্র*-এর বিষয়। প্রাচীন ভারতীয়রা কেবলমাত্র পারলৌকিক বিষয়ের চিন্তা করতেন, সযত্নে লালিত এই ধারণা *অর্থশাস্ত্র*-এর ভিত্তিতে বাতিল করা যায়। অপর দু'টি গ্রন্থ হল পাণিনীর *অষ্টাধ্যায়* এবং পতঞ্জলির *মহাভাষ্য* ব্যাকরণ গ্রন্থ আলোচনা করবার সময় পাণিনী সর্বদা বাস্তবজীবন থেকে উদাহরণ দিয়েছেন যা পাঠককে সমসাময়িক যুগের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অবহিত করে। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য* খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা। সমাজসচেতন লেখক ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের ভারত আক্রমণের সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করেছেন।

প্রাচীন ভারতে ধর্ম আধুনিক 'রিলিজিয়ন' অর্থে ব্যবহৃত নয়। ধর্ম বলতে চিরাচরিত রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-বিচার, নিয়ম, বিধিনিষেধ এগুলিকেই বোঝায়। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয় যেমন আছে, তেমন আছে বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, পারিবারিক জীবন ও বিবাহ, উত্তরাধিকার, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য উপদেশাত্মক এবং বেদবিহিত ঐতিহ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্রের আদর্শ সর্বদা অবিকৃতভাবে এই বিশাল উপমহাদেশের সর্বত্র সমানভাবে পালিত হত কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু আদর্শ রীতিনীতির পরিচয় এই তথ্যসূত্রে নিশ্চয়ই বিধৃত।

ধর্মশাস্ত্র—মনুর ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। গুপ্ত যুগের বিখ্যাত আইন গ্রন্থগুলির রচয়িতারা ছিলেন নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন। কাত্যায়ন আইন ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রাজা ছিলেন আইনের উৎস। বিচারের কাজে রাজাকে অন্যেরা সাহায্য করতেন। রাজা ছাড়া বিচার করবার অধিকার ছিল সমবায় সংঘ ও গ্রামসভাগুলির। বিচারের ভিত্তি ছিল আইনগ্রন্থ, প্রচলিত প্রথা ও রাজার আদেশ। কাত্যায়ন নিজে বর্ণগত শাস্তির সমর্থক ছিলেন কিন্তু সবক্ষেত্রে তা করা হত কিনা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ আছে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সুতরাং প্রাচীনকালের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা দেখতে পাই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থতেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাই। বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* কাব্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও চাণক্য কর্তৃক নন্দবংশের উচ্ছেদ এবং চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসন আরোহণের উল্লেখ আছে। *দেবী চন্দ্রগুপ্তম্* বিশাখদত্তেরই রচনা। এই নাটকে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের ছবি পাওয়া যায়। কালিদাসের *রঘুবংশম্* কাব্যে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয়ের আভাস পাওয়া যায়।

১.৪.৪ জীবনীগ্রন্থ

গুপ্ত পরবর্তী যুগের সাহিত্য উপাদানের মধ্যে দু'ধরনের উপাদানকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উৎস সন্ধানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। প্রথম ধরনের লেখা হল জীবনীগ্রন্থ, দ্বিতীয় ধরনের লেখা হল

স্থানীয় উপাখ্যান। বাণভট্টের লিখিত *হর্ষচরিত* গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থটিকে লেখক (ক) হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত এবং (খ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যর প্রথম দিকের রাজনৈতিক বিবরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হওয়ার জন্যে বইটির মর্যাদা হানি হয়েছে কোন সন্দেহ নেই। বাক্‌পতিরাজ *গৌড়বজে* কাব্যে কনৌজের যশোবর্মনের গৌরবগাথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এত যান্ত্রিকতার উপস্থাপন পদ্ধতি যে তার বিষয়বস্তুর সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। অনুরূপভাবে বিলহন লিখিত *বিক্রমাঙ্কিদেবচরিত* কাব্যে চালুক্য রাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের গৌরব বর্ণনা হয়েছে; কিন্তু কবির বর্ণনা বাস্তবানুগ নয়। জীবনী কাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে পাওয়া যায়। এটি কৈবর্ত বিদ্রোহের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ; কিন্তু কাব্যটি রামপালের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এবং বিরোধী পক্ষের কোন বক্তব্য স্থান পায়নি। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোকই দ্ব্যর্থক। এক অর্থে একটি রামচন্দ্রের কাহিনী, অপরদিকে সম্রাট রামপালের কাহিনী। অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে আছে জয়সিংহের *কুমারপালচরিত*, পদ্মগুপ্তের *নবসাহসাঙ্কচরিত*, ন্যায়চন্দ্রের *হাসির* কাব্য। এইসব গ্রন্থের সাহায্যে অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠন করা যায় না। পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এইসব গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিকদের দূরদৃষ্টি অনুপস্থিত।

ভারতবর্ষের সুবিপুল লিখিত সাহিত্যের সম্ভারে একমাত্র একটি পুস্তককে যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায়—সেটি হল কলহণের *রাজতরঙ্গিণী*। লেখক অতিপ্রাচীনকাল থেকে তার সময় পর্যন্ত কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন। পূর্বের লেখকদের লেখা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন। ১১৪৮ খ্রিঃ অব্দে কলহণ তার কাজ শুরু করেন এবং পরের কয়েক বছরে তা শেষ করেন। গ্রন্থ-এর প্রথম অংশে উপাখ্যান কিংবদন্তী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা আছে। খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতাব্দী থেকে তার আলোচনা অনেকটা ইতিহাসকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। রাজতরঙ্গিণীর ঐতিহ্য কাশ্মীরে মধ্যযুগেও অনুসৃত হয়েছিল, বেশ কয়েকটি বই ঐ নামে লেখা হয়; যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মধ্য যুগ অবধি কাশ্মীরের বিবরণ লেখা আছে।

গুজরাটের চালুক্য রাজাদের প্রশংসা করে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল এবং রাজা ছাড়াও চালুক্য রাজমন্ত্রী তেজঃপাল ও বাস্তুপালের জীবনী পাওয়া যায়। মন্ত্রীর জীবনীকারেরা প্রশাসনিক ইতিহাসের প্রতি জোর দিয়েছেন। গুজরাটের বিদগ্ধ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের লিখিত *দ্ব্যয়াশ্রু কাব্য* গ্রন্থে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। প্রথম শ্রেণীর ব্যাকরণবিদ্ হিসাবে তার লিখিত *সিদ্ধ-হেম-শব্দ-অনুশাসন*-ই যথেষ্ট ছিল। *দ্রব্যশাস্ত্র মহাকাব্য*-তে তিনি চালুক্যদের ইতিহাস ও ব্যাকরণ রচনা একই সঙ্গে করায় ইতিহাস রচনা তার যথার্থ মানে গিয়ে পৌঁছায়নি। এই সমস্ত রচনার মধ্যে লিখিত ইতিহাসের ঐতিহ্য প্রবহমান এবং ঐতিহ্যের এই ধারা সতত প্রবহমান, কিন্তু সর্বত্র একই রকমভাবে গতিশীল নয়।

১.৪.৫ বিদেশী সাহিত্য

দেশীয় সাহিত্যের বিবরণের পরই বৈদেশিক সাহিত্যের কথা আলোচনা করা দরকার। বৈদেশিক সাহিত্যের বিবরণীর দু'রকম ভাগ হতে পারে (১) যেসব বিদেশী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদের বিবরণ লিখেছেন (২) ভারতবর্ষে নিজেরা আসেননি কিন্তু অপরের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে তাদের বিবরণ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রচয়িতাদের মধ্যে হেরোডেটাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পারসিকদের অধীনস্থ ছিল এবং পারসিক যুদ্ধের সময় বহু ভারতীয় পারসিক সম্রাটের পক্ষ গ্রীসের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশ নিয়েছিল। বোধহয় এই সময় থেকেই গ্রীক লেখকদের ভারত সম্পর্কে কৌতূহল শুরু হয়। হেরোডেটাস ভারত সম্বন্ধে যে নানারকম তথ্য পরিবেশন করেছেন তার সবটাই হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সেই সুপ্রাচীনকালেও তিনি ভারত সম্পর্কে একটি সঠিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা জনবহুল। খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর আর একজন গ্রীক লেখক টিসিয়াস (৪১৬-৩৯৮ খ্রিঃপূঃ) ভারত সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখেছেন কিন্তু তার সমস্ত বিবরণই অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ।

আলেকজান্ডার তাঁর অভিযানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অনুসন্ধানের জন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ্‌কে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আলেকজান্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস সিন্ধু নদীর মোহানা থেকে পারস্য উপসাগর অবধি পরিভ্রমণের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লেখেন, যদিও মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। কিন্তু অ্যারিয়ান তাঁর বই ইন্ডিকা লেখার সময় নিয়ারকাসের বই-এর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অ্যারিয়ানের লেখা থেকে নিয়ারকাসের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে। নিয়ারকাসের অপর সাথী অ্যানিমিক্রিটাসও সমুদ্র অভিযানের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটিও অতিশোয়ক্তি দোষে দুষ্ট। অ্যারিস্টোবুলাস ছিলেন ভূগোলবিদ্; অ্যারিয়ন আলেকজান্ডারের বিবরণ লেখার সময় অ্যারিস্টোবুলাসকে ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টোবুলাস অতি বৃদ্ধ, প্রায় আশি বছর বয়সে তার লেখা শুরু করেছিলেন। সুতরাং স্মৃতিভ্রষ্টতাবশতঃ হয়তো তিনি অনেক কথা ভুল লিখতে পারেন। এই সমস্ত কারণের জন্যে খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা পুস্তকে। কিন্তু এখানেও মূল বইটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বট্রাবো, অ্যারিয়ান, জাস্টিন, ডায়াডোয়াস ইত্যাদি পরবর্তী লেখকেরা মেগাস্থিনিস থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন; মেগাস্থিনিসের রচনার সংক্ষিপ্তসার করেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে মেগাস্থিনিসের মূল বক্তব্য খুঁজে বার করতে হবে। তাঁর লেখায় (ক) ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের বর্ণনা (গ) ভারতে দাস প্রথার অনুপস্থিতি (ঘ) সাতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ, ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। ধ্রুপদী অন্যান্য গ্রীক লেখকদের মধ্যে আমরা খ্রিষ্পূঃ প্রথম শতাব্দীর অ্যারিবান, ডায়াডোয়াস, সিকুলাস ইত্যাদির নাম করতে পারি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক *পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী* বই লিখেছিলেন। বইটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং সকলের থেকে স্বতন্ত্র। লেখক বহুবার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসেছেন; ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, তার বৈদেশিক বাণিজ্য, নগর বন্দরের এক বিশ্বস্ত চিত্র তার লেখাতে খুঁজে পাওয়া যায়। টলেমি ছিলেন অতীতের প্রথিতযশা ভূগোলবিদ্। তার ভূগোল বই-এ ভারত সম্বন্ধে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। ক্লডিয়াস টলেমি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে তাঁর ভূগোল রচনা করেন। আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে রচিত এই গ্রন্থে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ সহ বহু ভারতীয় এলাকার উল্লেখ আছে। কিন্তু মানচিত্রে নানা ত্রুটির জন্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক আকার সম্পূর্ণ

বিকৃত হয়ে গিয়েছে। ত্রিকোণাকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশ টলেমির ভূগোলে প্রায় আয়তাকার। টলেমির মতো পেরিপ্লাসের লেখা দেখে বোঝা যায় যে তার ভূগোল বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল; ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মরুভূমি, পাহাড় ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বর্ণনা বাস্তবানুগ। ভৃগুকচ্চ থেকে কন্যাকুমারী অবধি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের এক নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষে টিয়ানার অ্যাপোলোনিয়াস ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। ২১৭ খ্রিঃ তার জীবনী লেখেন ফিলোবেট্রেটাস। অ্যাপোলোনিয়াসের সঙ্গী নাবিক ভামিস একটি বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছিলেন; তার উপর নির্ভর করে জীবনী লেখা হয়। দু'জনের মধ্যে ভামিসের বিবরণ গ্রহণযোগ্য, কারণ অনেকক্ষেত্রে তিনি নিজে যা দেখেছিলেন তার বিবরণ লিখেছেন। ভারত-রোম বাণিজ্যের যুগে বেশ কয়েকজন রোমান ঐতিহাসিক ভারতের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। এঁরা হলেন প্লুটাক, স্ট্রাবো এবং প্লিনী। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ভারতীয় সভ্যতার এক নির্ভরযোগ্য বাস্তব বিবরণ গ্রীক-রোমান লেখকদের কাছে পাওয়া যায়। বহু বিষয়, যার সম্বন্ধে সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য একেবারেই নীরব—গ্রীক-রোমান লেখকরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন; কিন্তু তাদের লেখার দু'একটি ত্রুটি দেখা যায়। যেমন, তারা ভারতীয় ভাষা, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার দরুন ভারতীয় সমাজকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন, ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; ফলে তাদের বিচার-বিবেচনা সর্বত্র সঠিক হয়েছে একথা বলা যাবে না।

গ্রীক-রোমান লেখকদের ভারত-রোম বাণিজ্য সম্পর্কের অবনতির পর ভারত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা করতে দেখা যায় না। কিন্তু এশীয় মহাদেশের অপর এক প্রান্ত থেকে ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হওয়ার পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক ভারত পরিভ্রমণে এসেছেন। এদের মধ্যে অনেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বিশেষভাবে গুপ্ত যুগে আগত ফা-হিয়েনের (৪০৫-১২ খ্রিঃ) নাম করতে পারি। এ ছাড়া, ৫১৮-৫২২ খ্রিঃ মগধের রাজসভায় সং-ইউনের দৌত এবং তার বিবরণ এবং সর্বোপরি হিউ-য়েন-সাং-এর বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এঁরা কেউ কেউ সরাসরিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেমন—ই-ৎ সিং শ্রী গুপ্তের কথা, হিউ-য়েন-সাং হর্ষবর্ধন এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজাদের কথা উল্লেখ করেছেন। সমস্ত চৈনিক পরিব্রাজকের মধ্যে আমরা হিউ-য়েন-সাং-কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে পারি; কারণ তিনি ভারতে দীর্ঘ দিন ছিলেন (৬২৯-৬৪৫ খ্রিঃ), ভারতীয় বিভিন্ন মহাবিহারে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং উত্তর ভারতের থানেশ্বর থেকে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী পর্যন্ত পর্যটন করেছেন; তাই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় তিনি অপরিহার্য। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অপর একজন পরিব্রাজক হলেন হুই-চাও (৭২৭ খ্রিঃপূঃ)। তাঁর লেখায় কনৌজের যশোবর্মন এবং কাশ্মীরের মুক্তাপীড় সম্বন্ধে জানতে পারি।

চৈনিক পরিব্রাজকদের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একটা কথা বলা যেতে পারে। তাদের কাছে ভারতের মূল্য ছিল তীর্থস্থান হিসাবে। তাঁরা বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করেছেন, বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করেছেন; সমসাময়িক ভারতের রাজনীতি নিয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত কম। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মোহাবিষ্ট হওয়ার জন্যে হিউ-য়েন-সাং-এর মতো প্রাজ্ঞ লেখক শশাঙ্ক সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারেননি।

মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধুপ্রদেশ জয়ের সঙ্গে (৭১২ খ্রিঃ) আরব দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে।

আরবীয় ও তুর্কী লেখকদের পার্থিব দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ এবং ইতিহাস সচেতনতা সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে এক নতুন আলোকপাত করে যা পূর্ব যুগের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়নি। ৮৫১ খ্রিঃ সুলেমান বণিক হিসাবে ভারত পর্যটন করতে এলে তিনি ভারতের রাজনৈতিক বিভাজন এবং প্রধান প্রধান রাজবংশের উল্লেখ করেন। ৯১৬ খ্রিঃ ইবন-খুরদাবিদের লেখায় ভারতের জাতিভেদের উল্লেখ দেখা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত আল ইদ্রিসির বিবরণে পশ্চিম সমুদ্র উপকূলের বন্দর ও শহরগুলির বিবরণ পাই। মূলতান এবং মনশুরা সম্বন্ধে তার বক্তব্য সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আবুল কাশিম লিখিত তবকাত্-উল-উমাস্ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার এক বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, শাহরিয়ার (৯০০ খ্রিঃ), ইবন রুস্তা (৯০২-৯০৩ খ্রিঃ), ইবন্-নাজিম (৯৯৫ খ্রিঃ), আবদুল করিম শাহরিস্তানি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সমকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। ভারতীয় ভূখণ্ড ও ভারতের নানা শহর বন্দর রাজ্য প্রভৃতির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যাবে অজ্ঞাত লেখকের পারসিক গ্রন্থ *হুডুড-অল-আলম*-এ (৯৮২ খ্রিঃ)।

সর্বোৎকৃষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় আল-বিরুনীর *কিতাব-উল-হিন্দ* গ্রন্থে। গজনীর সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, মাহমুদ যখন ভারতবিজয়ে ব্যস্ত তিনি সেই অবসরে ভারতবর্ষের ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত, জ্যোতিষ, দর্শন, ধর্মচর্চা এবং অধ্যয়নে রত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিবরণ লেখার সময় তিনি পূর্বেকার লেখকদের চেয়ে ভারতবর্ষের সমস্যার প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তাঁর গ্রন্থকে বিন্যস্ত করেছেন। ভারতীয়দের ইতিহাস চর্চার প্রতি অনীহার দৃষ্টিভঙ্গিটি তিনি লক্ষ্য করেন এবং তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

আল বিরুনী ছাড়াও আরো অনেক লেখককে আমরা পাই কিন্তু তালিকা দীর্ঘতর করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপন অবদান রেখেছেন এবং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ সহজতর হয়েছে।

১.৫ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। লেখমালা ও মুদ্রার সাহায্যে কীভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠন করা যায় উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করুন।

২। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস এবং লিখিত উৎসের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনায় প্রত্নতত্ত্বের অপরিহার্যতা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কার্বন[১৪] পদ্ধতি কাকে বলে? এই পদ্ধতি ইতিহাসকে কীভাবে সাহায্য করে আলোচনা করুন।

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় গ্রীক রোমান লেখকদের অবদানের বিবরণ দিন।

৩. প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় মুদ্রাকে কীভাবে ব্যবহার করবেন?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করুন।

২। ঐতিহাসিক উৎসের শ্রেণীবিভাজন করুন।

৩। হিউ-য়েন-সাংকে কেন শ্রেষ্ঠ বৈদেশিক পর্যটক বলা হয়?

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। ডি. সি. সরকার—*ইনস্‌ক্রিপশনস্‌ অফ্‌ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া* (১৯৮৩)

২। আর. এস. শর্মা—*পারস্‌পেকটিভস্‌ ইন সোশ্যাল এ্যান্ড ইক্‌নমিক্‌ হিস্ট্রী অফ্‌ আর্লি ইন্ডিয়া* (১৯৮১)

৩। আর. সি. মজুমদার—*দি বেদিক এজ্‌*

৪। পি. এল. গুপ্ত—*ইন্ডিয়ান কয়েনস্‌*

৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—*প্রাচীন মুদ্রা* (মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখবন্ধ) (১৯৮৮)

৬। ভারত সরকার প্রকাশিত—*গেজেটিয়ারস্‌ অফ্‌ ইন্ডিয়া*